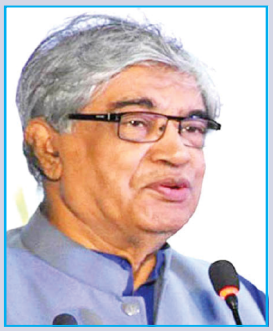

মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও
তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

অনলাইন ক্লাসের সাত সতেরো

করোনার সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় সারা বিশ্বের মতো আমরাও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনলাইনে ক্লাস নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছি। পূর্বপ্রস্তুতি না থাকার কারণে শুরু থেকেই পদে পদে হোঁচট খেয়ে চলেছি

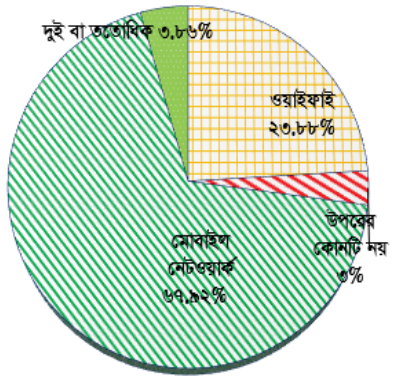

কী ধরনের ইন্টারনেট আছে

আমরা। কেমন করে ক্লাস হবে, শিক্ষকেরা কীভাবে ক্লাস নেবেন, ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে এতে অংশ নেবে, ইন্টারনেটের কী হবে, টিভিতে ক্লাস হবে নাকি ইন্টারনেটে ক্লাস হবে এমন হাজারো প্রশ্ন সর্বত্র ঘুরপাক খাচ্ছে। এরই মাঝে অনেকেই অনলাইন ক্লাস শুরু করেছেন। সংসদ টিভির মাধ্যমে টিভিকে ব্যবহার করে অনলাইন ক্লাসের সূচনা হয়। তবে এখন জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন বা গ্রামেও ইন্টারনেটভিত্তিক অনলাইন ক্লাস চালু হয়েছে। আলোচনা চলছে রেডিও-কমিউনিটি রেডিও ব্যবহার করে ক্লাস করা যায় কিনা। এমনকি সব পর্যায়ের অনলাইনে ক্লাসের একটি সমন্বিত রূপদানের জন্যও চেষ্টা চলছে। শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী, এটুআই, টেলিকম সংস্থা, বিটিআরসি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সমন্বিতভাবে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে।

বর্তমানে চলমান ক্লাসের গুণগত মান বা এর প্রভাব বা অর্জন নিয়ে গবেষণার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত এই সূচনাটিকেই স্বাগত জানানোটা আমাদের দিক থেকে বড় পাওনা।

এসব অনলাইন ক্লাসের জন্য এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইস। ইন্টারনেট পাওয়ার দুটো উপায় আছে। একটি হলো আইএসপিদের দেয়া ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট। অন্যটি হলো মোবাইল ইন্টারনেট। ডিজিটাল ডিভাইসও অন্তত তিন ধরনের হতে পারে। প্রথমত কমপিউটার যা ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ হতে পারে, ট্যাবলেট যা ল্যাপটপের ছোট সংস্করণ এবং ল্যাপটপ-মোবাইলের মিশ্রণ এবং তৃতীয়টি হলো স্মার্টফোন। আমরা এখনও জানি না অনলাইন ক্লাস নিয়ে প্রতিদিন যত প্রশ্নের জন্ম নিচ্ছে তার জবাব বা সমাধান আমরা কেমন করে কতদিনে পাব।

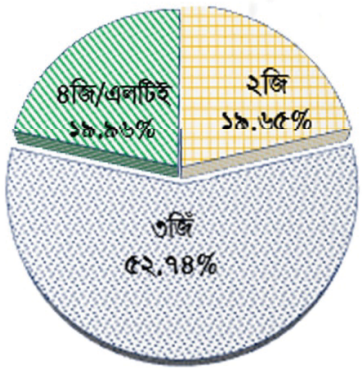

কী ধরনের মোবাইল ইন্টারনেট আছে

মনে হচ্ছে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটি নিয়েই নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে। নিবন্ধটি যেদিন প্রথম লিখি সেদিন দুটি পত্রিকার খবর পেলাম অনলাইন বিষয়ে। ক) ২৫ জুলাইয়ের দৈনিক ডেইলি স্টার পত্রিকায় মহিউদ্দিন আলমগীরের নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে– মাহমুদা খাতুনকে তার মনিপুর স্কুলে পড়ুয়া সন্তানের জন্য মাসে বাড়তি সাতশ টাকার ইন্টারনেট কিনতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ৩ হাজার টাকা দিয়ে তাকে রাউটারও কিনতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সাবরিনা ইসলাম বন্যাকে প্রতি দুদিন ক্লাসের জন্য ১১৪ টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। মোহাম্মদপুর সরকারি স্কুলের একজন শিক্ষক জানিয়েছেন তাকে ব্রডব্যান্ড কানেকশন নেয়ার পাশাপাশি হুয়াইট বোর্ড ও মার্কার কিনতে হয়েছে। ফেসবুকের একটি ছবি আমাকে আবেগাপ্লুত করেছিল। ছবিতে একজন শিক্ষক তার মোবাইল ফোনটা দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে ক্লাস নিচ্ছিলেন। পত্রিকার পাতায় খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, একটি প্রতিষ্ঠান সেই ছবি দেখে মোবাইল ফোন ও স্ট্যান্ড দান করেছে।

আমাদের দেশী পত্রিকাতেই ভারতের হিমাচল প্রদেশের জ্বালামুখী এলাকার এক কৃষক বাবা-মা সন্তানের অনলাইন ক্লাস করার টাকা জোগাতে গরু বিক্রি করে দিয়েছে বলেও খবর প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষক সন্তানের অনলাইন ক্লাস করার জন্য গরু বিক্রি করেছে এমন খবর না এলেও এটি আমরা বুঝি যে, অনলাইন ক্লাস করার জন্য যে ধরনের ডিজিটাল যন্ত্র থাকা দরকার তা বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের নেই। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো সম্ভাবনা থাকলেও মাধ্যমিক স্তরের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। প্রাথমিক স্তরের কথা তো ভাবাই যায় না।

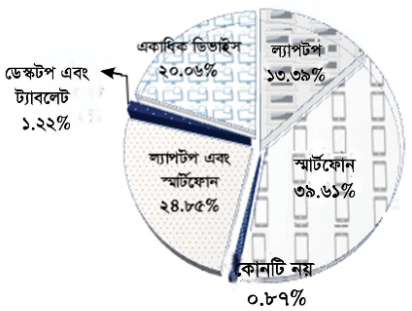

কী ধরনের ডিভাইস আছে

আমরা যখন এসব বিষয় নিয়ে নানাবিধ আলোচনা করছি তখন আলোচনার কেন্দ্র আবর্তিত হয়েছে আন্দাজে পাওয়া তথ্যের ওপর। বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোন স্তরে অনলাইন ক্লাসের কী অবস্থা তা জানি না। এরই মাঝে আমার হাতে চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জরিপ আসে। এক সময়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে কাজ করতেন এবং এখন অবসরপ্রাপ্ত আতাউর রহমান সেই জরিপটির কপি আমাকে দেন। আমি তার কাছ থেকে জরিপটি প্রকাশ করার অনুমতি নিয়েছি। আমার নিজের কাছে তথ্যগুলো খুবই মজাদার মনে হয়েছে।

বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসের জরিপের সারসংক্ষেপ

চুয়েটে চলমান সেশনে নিবন্ধিত মোট শিক্ষার্থী : ২৩৯১, জরিপে উপস্থিত : ২০৯৭ (স্বতন্ত্র ডাটার ভিত্তিতে), ডাটা নেয়া হয়েছে

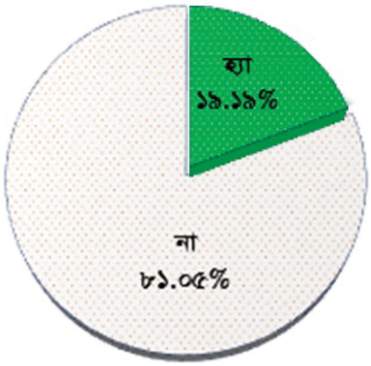

অনলাইন কোর্স করেছে কি-না

৩০ মে ২০২০ সময় বিকেল ৩:০০টা। জরিপে উপস্থিতির মোট হার ৮৭.৭০ শতাংশ। শিক্ষার্থীদের জরিপে তাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তাদের কাছে কী ধরনের ইন্টারনেট রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ২৩.৮৮ ভাগ জানিয়েছে যে, তাদের কাছে ওয়াইফাই আছে। মাত্র ০.৫১ ভাগ জানিয়েছে যে, তাদের কাছে ওয়াইফাই ও ল্যান রয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক রয়েছে শতকরা ৬৭.৯২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে। কোনো ধরনের ইন্টারনেট নেই শতকরা ৩ ভাগের হাতে। অন্যদিকে ওয়াইফাই এবং মোবাইল ইন্টারনেট রয়েছে শতকরা ৩.৮৬ ভাগের হাতে। জরিপে মোবাইল ইন্টারনেট সুবিধার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরদানকারীরা জানায় যে, ১৯.৬৫ ভাগের কাছে ২জি, ৫২.৭৪ ভাগের কাছে ৩জি

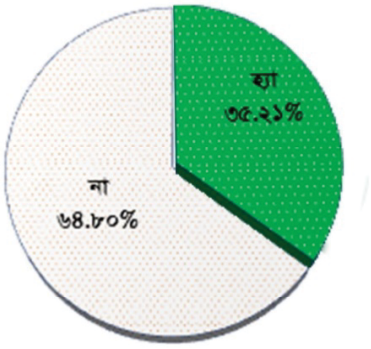

অনলাইন কোর্সের জন্য প্রশিক্ষণ দরকার

ও ১৯.৯৬ ভাগের কাছে পৌঁছায় ৪জি। জরিপে জানা গেছে যে, শতকরা ৩.৪১ ভাগের কাছে ইন্টারনেট সহজে ক্রয়যোগ্য। শতকরা ১৭.৫৭ ভাগ এটি কিনতে পারে এবং কিনতে চাপ সৃষ্টি হয় শতকরা ৫৩.৬২ ভাগের। ২০.৯৮ ভাগ বলেছে যে, তাদের কাছে ইন্টারনেট ক্রয়যোগ্য নয়। ৪.৮৯ ভাগের মতে, মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায়নি।

চুয়েটের জরিপে ডিভাইস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল আপনি কোন ধরনের ডিভাইসের মালিক। জবাব এসেছে যে, ১৩.৩৯ ভাগ ল্যাপটপের মালিক, ডেস্কটপ এবং ট্যাবলেট ১.২২ ভাগ, ল্যাপটপ ও স্মার্টফোন আছে ২৪.৮৫ ভাগের। স্মার্টফোন আছে ৩৯.৬১ ভাগের। একাধিক ডিভাইস আছে ২০.০৬ ভাগের। কোনো ডিভাইস নেই ০.৮৭ ভাগের।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তারা কোন ধরনের কনফারেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। জবাবে বলা হয়েছে, গুগল হ্যাং আউট ৪.১৮, স্কাইপে ৬.৫২, জুম ১৪.৪৬, মাইক্রোসফট টিম ০.৩৬ এবং কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করেনি ৬২.৮৩ ভাগ।

এটি অবাক হওয়ার বিষয় নয় যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী কোনো কনফারেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে না। এর প্রধানত কারণ হচ্ছে দেশে এর প্রচলন ছিল না। করোনার

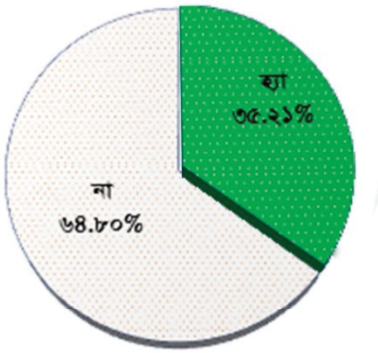

অনলাইন ক্লাস চায় কি-না

আগে কদাচিৎ কেউ কোনো কনফারেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। একইভাবে জরিপে জানা যায় যে শতকরা মাত্র ১৯.১৯ ভাগ শিক্ষার্থী কোনো অনলাইন কোর্স করেছে এবং ৮১.০৫ ভাগ সেটি করেনি। জরিপে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, অনলাইন কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণের দরকার আছে কি-না। এর জবাবে শতকরা ৫৬.১০ ভাগ হ্যাঁ বলেছে ও ৪৩.৯০ ভাগ না বলেছে। জরিপের শেষ প্রশ্নটি ছিল যে, শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাস চালু করা সমর্থন করে কি-না। এর জবাবে মাত্র শতকরা ৩৫.২১ ভাগ হ্যাঁ বলেছে এবং ৬৪.৮০ ভাগ না বলেছে।

চুয়েট জরিপের পাঁচটি বিষয়ে জরিপকারীরা তাদের পর্যবেক্ষণও প্রকাশ করেছে

প্রথমত তারা ইন্টারনেটের তরঙ্গ সুবিধা নিয়ে বলেছে : ক) বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ২জি এবং ৩জি স্তরের ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল, যা সরাসরি ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে

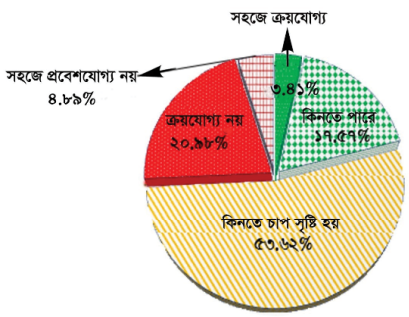

ইন্টারনেট কেনার ক্ষমতা

বাধা সৃষ্টি করতে পারে। অতএব অনলাইন ক্লাসগুলো রেকর্ড করা যেতে পারে এবং চুয়েট ওয়েবসাইট থেকে অফলাইনে ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য করা যেতে পারে।

চুয়েটের আরও একটি পর্যবেক্ষণ হলো : খ) জরিপ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ (২০ শতাংশ) অনলাইন ক্লাসের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ পরিচালনা করতে সক্ষম। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীদের সাশ্রয়ের কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আর্থিক বিষয় বা ডাটা সহায়তার দিকে নজর দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া দরকার। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দেশব্যাপী সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ইস্যুটি মন্ত্রণালয়ে আনা যেতে পারে।

চুয়েটের তৃতীয় পর্যবেক্ষণ হলো : গ) ডিভাইসবিহীন ১ শতাংশের কম শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাসগুলোতে অংশ নিতে পারে যেটি প্রশাসনকে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করতে উৎসাহিত করে। প্রায় ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, যা অনলাইন ক্লাসের জন্য ভালো ডিভাইস নয়। সুতরাং ল্যাপটপ কেনার জন্য লোন শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সহায়ক হতে পারে।

চুয়েটের চতুর্থ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে : ঘ) বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাসে অংশ নিয়ে অভিজ্ঞ নয়। সংযোগকারী ডিভাইসগুলো থেকে অনলাইন সরঞ্জাম অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রাসঙ্গিক সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থা, উপকরণ এবং স্মার্ট শিক্ষাব্যবস্থার প্রশিক্ষণের সাথে আরো ভালোভাবে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষা সরঞ্জামগুলোর ব্যবহার অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

চুয়েটের পঞ্চম পর্যবেক্ষণ হলো : ঙ) বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাসের ধারণা সমর্থন করে না। বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রচেষ্টা সফল করতে অনলাইন ক্লাসের সুবিধা তুলে ধরে অনুপ্রেরণামূলক প্রচারের প্রয়োজন।

চুয়েট কর্তৃপক্ষ জরিপ করার পর অনলাইন ক্লাস বিষয়ে কিছু সুপারিশ পেশ করেছে।

তাদের প্রথম সুপারিশটি হচ্ছে যে অবিলম্বে স্নাতকোত্তর ক্লাস শুরু করা যেতে পারে। দ্বিতীয় সুপারিশটি হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের টার্ম ১-এর স্নাতক পর্যায়ের তত্ত্বীয় ক্লাসগুলো পর্যবেক্ষণগুলোর আলোকে শুরু করা যেতে পারে। তৃতীয় সুপারিশটি হলো : স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পরীক্ষা এবং স্নাতক পর্যায়ের সেশনাল ক্লাসসমূহের বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। চতুর্থ সুপারিশটি হলো অনলাইন ক্লাস শুরু করার আগে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। পঞ্চম বা শেষ সুপারিশটি হলো অনলাইন ক্লাসের জন্য জুম এবং গুগল মিট উভয় প্ল্যাটফরম ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুই

চুয়েটের পুরো জরিপের তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ থেকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করা জরুরি হয়ে উঠেছে। জরিপের কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা প্রয়োজন।

ক) সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশ অনলাইন ক্লাস করতেই ইচ্ছুক নন। জরিপের এই ফলাফল কষ্ট পাওয়ার চাইতেও বেশি। দেশটির নতুন প্রজন্মকে কেমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং তাদের মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ের সেটি এর ফলে প্রমাণিত হয়। শিক্ষা বিশেষজ্ঞেরা আশা করি এই উপাত্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবেন যে দেশটির আগামী দিনের নাগরিকেরা কতটা এই যুগে বসবাস করার উপযোগী। গাইবান্ধার উকিলেরা যে ভার্চুয়াল কোর্ট করতে অপারগ এটি তারই প্রতিফলন ও আরও একটি প্রামাণ্য দলিল। এতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাদান পদ্ধতি থেকে দেশটিকে আমরা বের করতে পারিনি। যদি পর্যালোচনা করা হয়, কেন তারা অনলাইন ক্লাস করতে চায় না তবে নিশ্চয়ই অসংখ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেসব সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে তার মাঝে থাকবে ওরা এমন ক্লাস করতে অভ্যস্ত নয়, তাদের ইন্টারনেট পরিচিতি ও ডিজিটাল দক্ষতা নেই, তাদের ডিজিটাল যন্ত্র বা ডিজিটাল সংযুক্তিও নেই। তবে সবচেয়ে বড় কারণ হয়তো মানসিকতার অভাব।

খ) অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থীর ইন্টারনেট ক্রয় করার ক্ষেত্রে চাপ অনুভব করার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রমাণিত হয় যে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজ করছে, তার ফলে সাধারণ মানুষ প্রযুক্তি কেনার সক্ষমতা অর্জন করেনি। এটি ডিজিটাল বৈষম্য তৈরি করার সবচেয়ে বড় কারণ। অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল বৈষম্য দূর না করলে, আর যাই হোক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা যাবে না।

গ) তৃতীয়ত শতকরা মাত্র ১৪ ভাগের কাছে ৪জি পৌঁছানোটা উদ্বেগজনক। যদিও মাত্র ২০১৮ সালে ৪জি চালু করা হয়েছে তথাপি এখন সবাই উপলব্ধি করছে, এর প্রসার আরও দ্রুতগতিতে হতে হবে। ২০১৩ সালে থ্রিজি চালু করে ২০ সালেও তার সম্পূর্ণ প্রসার না হওয়াতে যে সংকট তৈরি হয়নি সেটি দুই বছরে ৪জি চালু করতে না পারায় হয়েছে। যে কোনোভাবেই হোক ৪জি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিদ্যমান অবস্থাকে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে করা যাবে না।

ঘ) চতুর্থত শতকরা ৮১ ভাগ কোনো অনলাইন কোর্স করেনি। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে যে চিৎকার করে আসছি এখন তার প্রমাণ দেখছি যে আমাদের প্রকৌশল বিষয়ে যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে তারাও ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। আমাদেরকে বুঝতে হবে কী মারাত্মক ভুল পথে আমরা চলছি।

ঙ) পঞ্চমত শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগের প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। এখন যেখানে শতভাগ উচ্চ শিক্ষার্থীর কোনো না কোনোভাবে অনলাইনে কিছু না কিছু শেখার কথা সেখানে আমাদের শতকরা ৬৫ ভাগকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে অনলাইন ক্লাসে যুক্ত করতে।

আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে আরও দুটি বিষয় জরিপবিষয়ক প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আসা উচিত। প্রথমত, যারা অনলাইন ক্লাস নিচ্ছেন তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতার স্তর কোনটি। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত ধারার চক-ডাস্টারের অনলাইন ক্লাস কি এই জাতির শিক্ষার ভবিষ্যৎ নাকি এই জাতির শিক্ষাকে ডিজিটাল করার জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমি যদি পাঠক্রম এবং পাঠদান পদ্ধতির কথা আলোচনায় নাও আনি তবুও ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণাকারী দেশের শিক্ষা এনালগ যুগের বা প্রথম শিল্পবিপ্লবের যুগের

থাকবে সেটি কারও প্রত্যাশিত নয়। চুয়েটের জরিপটি জাতীয় জরিপের একটি ভিত্তি হতে পারে। আমি অবশ্য প্রত্যাশা করি যে চুয়েটের মতো আরও অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রয়োজনেই জরিপ করবে। তবে কাজটি সমন্বিত হতে পারলে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি এমন জরিপ করত তবে সব পক্ষেরই উপকার হতো।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি জরিপ করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অনলাইন ক্লাস কেমন অবস্থায় আছে তার একটি চিত্র পেয়েছি আমরা। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের একই চিত্র হবে সেটিও মনে করার কোনো কারণ নেই। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আলাদা আলাদা চিত্র হতে পারে, আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আলাদা চিত্র হতে পারে। কলেজগুলোর সমস্যা অন্যরকম হতে পারে। অন্যদিকে যদি উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের অনলাইন ক্লাস নিয়ে জরিপ করা হয় তার চিত্রটা একদমই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে পারে।

আমি যখন চুয়েটের জরিপটি নিয়ে কাজ করছিলাম তখনই নজরে এলো আরও একটি লেখা। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় ইংরেজিতে প্রকাশিত এই লেখাটির লেখক ৪ জন। ড. মোহাম্মাদ সাওগাতুল ইসলাম, কে এম তানভির, মোহাম্মদ সালমান ও ড. মুনিয়া আমিন। লেখাটি ১ জুন ২০২০ প্রকাশিত হয়। কার্যত এটিও অনলাইন ক্লাসবিষয়ক একটি জরিপ। তাদের জরিপ অনুসারে শতকরা ৫৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী অনলাইন ক্লাস করার জন্য যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ পায় না। আমরা জানি, বাংলাদেশে করোনা শনাক্ত হয় ৮ মার্চ এবং ১৭ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৪২টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর ওপর পরিচালিত জরিপ অনুসারে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ৬৬ ভাগ নগরে ও ৩৪ ভাগ গ্রামে অবস্থান করছিল। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে শতকরা ৫৫ ভাগ বিজ্ঞানের, ১২.১ ভাগ মানবিকের, ১১.২ ভাগ সমাজবিজ্ঞানের, ব্যবসায় শিক্ষার শতকরা ১২ ভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ের শতকরা ৪.৭ ভাগ ছিল। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ছিল শতকরা ৫৮.৮ ভাগ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১.২ ভাগ। এদের শতকরা ২৩ ভাগ মাত্র অনলাইন ক্লাস নিতে ইচ্ছুক এবং শতকরা ৭৭ ভাগ অনলাইন ক্লাস করতে ইচ্ছুক নয়। লেখকবৃন্দ এই করুণ অবস্থার কারণও খুঁজে পেয়েছেন। তারা দেখেছেন যে, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা মাত্র শতকরা ৫৩.৩ ভাগের কোনো ডিজিটাল যন্ত্র যেমন ল্যাপটপ বা ট্যাব ইত্যাদি রয়েছে। ফলে ৪৪.৭ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছা থাকলেও অনলাইন ক্লাসে যোগ দিতে সক্ষম নয়। জরিপে আরও দেখা গেছে যে, শতকরা ৫৫ ভাগের অনলাইনে ক্লাস নেয়ার মতো ইন্টারনেট সংযোগই নেই। অন্য অর্থে তারা যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ পায় না। শতকরা ৪০ ভাগ অনলাইন ক্লাসে অংশ নিতে পেয়েছে যার শতকরা ৭০ ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। অতি চমৎকার কিছু তথ্য দিয়েছেন লেখকবৃন্দ। তারা জরিপে দেখেছেন যে, শতকরা ৮৭ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী মনে করে অনলাইনে মূল্যায়ন কোনোভাবেই কার্যকর হবে না। অন্যদিকে শতকরা ৮২ ভাগ মনে করে সরাসরি ক্লাস করাটাই সমুচিত। লেখকবৃন্দ মতামত দেন যে, ইন্টারনেটের সমস্যাটা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়ায়। তাছাড়া এত লম্বা সময় গ্রামে থাকতে হবে সেই প্রস্তুতি নিয়েও যায়নি। তারা এটিও মনে করেন যে, ইন্টারনেট কেনার ক্ষমতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের হিসেবে প্রতিটি ছাত্রকে দিনে অন্তত ১ জিবি ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করতে হয়। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর এই পরিমাণ ডাটা কেনার সামর্থ্য নেই বলে লেখকগণ মনে করেন। তাদের বিবেচনায় শুধু অনলাইন ক্লাস করাটাই নয় তাদের আরও বেশি ডাটা লাগে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি অনুসন্ধান করার জন্য। তারাই তথ্য দেন যে, দেশে এখন (সেপ্টেম্বর ১৮) ১৪৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১০ লাখ ২৮ হাজার ৩১৪ ছাত্র-ছাত্রী এবং ২৯ হাজার ৩৭৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। লেখকবৃন্দ যেসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেগুলো হলো– ক) অনলাইন পরীক্ষা নেয়া ও তার ডিজাইন করা। খ) অনলাইন শিক্ষার উপযুক্ত টুলের অভাব এবং প্রচলিত শিক্ষার সাথে এসব টুলের সমন্বয়। গ) অনলাইন ক্লাস নেয়ার জন্য শিক্ষকদের যথাযথ যোগ্যতার কমতি। ৪) সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের সমন্বয় নেই। লেখকগণ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য সুযোগ তৈরি করবে বলেও মনে করেন।

https://tbsnews.net/thoughts/online-classes-university-students-bangladesh-during-covid-19-pandemic-it-feasible-87454

যে দুটি জরিপ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে তার দুটিই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের। কিন্তু বাংলাদেশে এখন অনলাইন ক্লাসের যে অবস্থা তা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত তো নয়ই বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বা শিক্ষককুলের অবস্থান মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখার মতো নয়। খুব সঙ্গত কারণেই এই দুটি জরিপ বা আলোচনা থেকে বাংলাদেশের অনলাইন ক্লাসের কোনো চিত্রই পাওয়া যাবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাধ্যমিক বা প্রাথমিক স্তরের অনলাইন ক্লাস সম্পর্কে কোনো ধারণাই কোথাও নেই। আমার জ্ঞাতসারে সারা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনলাইন ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। এদের সংখ্যা কত এবং কী পরিমাণ শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ছাত্র-ছাত্রী এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত রয়েছে তা কেউ বলতে পারবে বলে মনে হয় না। করোনার অবস্থা এখন যা তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা, স্বাভাবিক ক্লাস চালু, পরীক্ষা নেয়া ইত্যাদি নানা জটিলতা কাজ করছে।

অতি সম্প্রতি নিজের চেষ্টায় আমি একটি উপজেলার প্রাথমিক স্তরের অনলাইন ক্লাসের

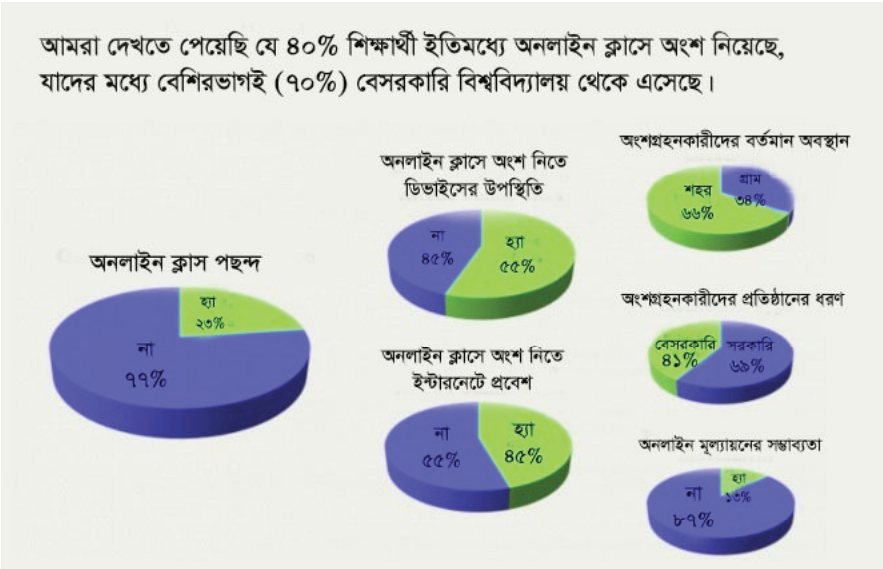

তথ্যাদি সংগ্রহ করি। আমার উপজেলা খালিয়াজুরীতে মোট ৬৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের ৬১টিতেই একটি করে ডিজিটাল ক্লাসরুম আমিই করে দিয়েছি। এরই মাঝে এই এলাকায় বিশেষভাবে টেলিটকের ৪জি নেটওয়ার্কও গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ফলাফলটি মোটেই সন্তোষজনক নয়। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে মাত্র ২০টি প্রতিষ্ঠান অনলাইন ক্লাস করেছে। ২০টির মাঝেও মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১১টি ক্লাস করেছে। সবাই মিলে অনলাইন ক্লাস করেছে মাত্র ৯৫টি। এদের প্রত্যেকের কাছে ডিজিটাল কনটেন্ট থাকার পরও তারা মাত্র তিনটি ক্লাস করার সময় ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করেছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো কেন নিজেরা অনলাইন ক্লাস করেনি বা কেন অন্য কারও অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হয়নি তার কোনো জবাব সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তারা দিতে পারেননি। এসব ক্লাস সমন্বিতভাবেও করা হয়নি। প্রাথমিক স্তরে সমন্বিতভাবে ৯৫টি ক্লাস করা হলে সেটি শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাপক সহায়ক হতো। এগুলো ইন্টারনেটে আপলোড করা থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা সেগুলো তাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারত। একটি তথ্য জানা সম্ভবই হয়নি যে এই সময়ে এসব ক্লাসের বিপরীতে কী পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়েছে। তাদের সমস্যাগুলোও জানা যায়নি। উপজেলা শিক্ষা অফিসার শুধু একটি মন্তব্য করেছেন যে, এদের বেশিরভাগ শিক্ষকই অনলাইন ক্লাস নিতে জানে না।

তিন

মাত্র তিনটি সূত্রে পাওয়া তথাদি বিশ্লেষণ করে আমরা অনলাইন ক্লাশের বেশ কিছু সাধারণ চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলতে পারি। যদি আমরা শুধু অনলাইন ক্লাস বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচলিত ক্লাস নেয়াকে বিষয়বস্তু হিসেবে দেখি তবে টেলিভিশন, রেডিও বা ইন্টারনেট তিনটিকেই বাহন হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। যদিও রেডিওতে দৃশ্যমান কিছু প্রদর্শন করার সুযোগ নেই তথাপি কোনো ধরনের শিক্ষা না গ্রহণের চাইতে রেডিওর ক্লাসও মন্দের ভালো। বিশেষ করে শিক্ষকেরা যদি রেডিওকে শব্দভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে দৃশ্যমানতার বিষয়গুলো শাব্দিক বিবরণ সহকারে উপস্থাপন করেন তবে রেডিও টিভির পুরো ঘাটতি পূরণ না করলেও টিভি নেটওয়ার্ক না থাকার দৈন্যদশাকে পূরণ করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা সচিবের দেয়া তথ্য অনুসারে টিভি ও রেডিওর সহায়তায় দেশের শতকরা ৯৭ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে অনলাইন শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। তিনি এটিও জানিয়েছেন যে, শতকরা ৯৭ ভাগ মানুষের মোবাইল ফোন রয়েছে। (এটিএন নিউজ-৯ সেপ্টেম্বর ২০২০, নিউজআওয়ার এক্সট্রা)। শিক্ষা সচিব অনলাইন শিক্ষার যে বাহনকে চিহ্নিত করেছেন ডিজিটাল যুগে সেইসব বাহন অনলাইন শিক্ষার বাহন হিসেবে কতটা গুরুত্ব বহন করে সেটি ভাবতে হবে। এইসব মাধ্যম শুধু প্রাচীন-দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের পণ্য-যোগাযোগ মাধ্যম নয়, ডিজিটাল যুগে দিনে দিনে ওরা হারিয়ে যেতে বসেছে। হতে পারে ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে আমাদের দুর্বলতার জন্য রেডিও-টিভিকে আমরা অনলাইন ক্লাসের বাহন হিসেবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি তবে এই দুটি মাধ্যমকে ডিজিটাল যুগের অনলাইন শিক্ষার বাহন হিসেবে আমি গ্রহণ করতে পারছি না। বরং আমি শিক্ষা গ্রহণ করছি যে এই অবস্থাটি অবশ্যই পাল্টাতে হবে এবং শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর ডিজিটাল মহাসড়ক ধরেই হবে।

কিন্তু সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল স্রোতটি যদি আমরা উপলব্ধি করি তবে এটি স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে অনলাইন ক্লাস বা অনলাইন শিক্ষা নামের স্বপ্নটা আসলে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের। শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে ৩৩ বছরের ধারণা ও ২০ বছরের বেশি সময় সরাসরি কাজ করার প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে আমার প্রচুর লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছে। আমি বিস্তারিতভাবে লিখেছি শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর কেমন করে করতে হবে। কাজও করছি শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে কথা বলতে গিয়ে গালিগালাজ খেলেও কাজটি করেই গেছি এবং এখন আমার হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ডিজিটাল কনটেন্ট রয়েছে, যা দিয়ে শিক্ষার্থী বাড়ি বসে ইন্টারনেট ছাড়াই নিজে নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। একই পদ্ধতি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষায় প্রয়োগ করা যায়। আমি এই পদ্ধতি এরই মাঝে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করে সফল হয়েছি। এবার এসব কনটেন্ট ফ্রি করেও দিয়েছি। আশা করি, লাখ লাখ শিশু তাতে উপকৃতও হয়েছে। সরকার ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৮টি পাড়া কেন্দ্রে এই ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তবে আমি ডিজিটাল শিক্ষার যে রূপটা ৩৩ বছর ধরে লালন করছি সেটি আমাদের জাতীয় ব্যবস্থায় প্রয়োগ হবে কবে বা আদৌ হবে কি-না সেটি আমি জানি না। আমি হয়তো আমার প্রচেষ্টাটি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারব। তবে জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা ছাড়া আমরা ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে পারব না।

আপাতত আমাদের চলমান অনলাইন ক্লাস শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর নয় সেই বিষয়টি জোরের সাথে বলেই কেবলমাত্র অনলাইন ক্লাস বিষয়টি নিয়েই কিছু কথা বলি।

আপনারা বিস্মিত হতে পারেন যে, আমেরিকানরা ২০১২ সালে অনলাইন ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১১ নভেম্বর ২০১২ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, NEW YORK -- In a radical rethinking of what it means to go to school, states and districts nationwide are launching online public schools that let students from kindergarten to 12th grade take some -- or all -- of their classes from their bedrooms, living rooms and kitchens. Other states and districts are bringing students into brick-and-mortar schools for instruction that is largely computer-based and self-directed.

Nationwide, an estimated 250,000 students are enrolled in full-time virtual schools, up 40 percent in the last three years, according to Evergreen Education Group, a consulting firm that works with online schools. More than two million pupils take at least one class online, according to the International Association for K-12 Online Learning, a trade group.

Advocates say that online schooling can save states money, offer curricula customized to each student and give parents more choice in education.

A few states, however, have found that students enrolled full-time in virtual schools score significantly lower on standardized tests, and make less academic progress from year to year, than their peers. Critics worry that kids in online classes don't learn how to get along with others or participate in group discussions. Some advocates of full-time cyberschools say that the disappointing results are partly because some of the students had a rough time in traditional schools, and arrive testing below grade level in one or more subjects.

(https://www.foxnews.com/us/u-s-public-schools-turn-to-digital-education#ixzz1hevv1jDt)

এরপর বিগত ৮ বছরে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় অনলাইন পদ্ধতি কতটা প্রভাব ফেলেছে তার সঠিক কোনো তথ্য আমার হাতে এখন নেই। উইকিপিডিয়ায় (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_colleges_in_the_United_States) প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আমেরিকায় ডিস্ট্যান্স এডুকেশন এক্রিডিটেশন কমিশন নামের একটি সংস্থা অনেকগুলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে অনলাইন কোর্স চালু করার অনুমতি দিয়েছে। করোনাকালে অনলাইনে ক্লাস নেয়ার জন্য এই সংস্থার স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ঘটনাচক্রে বাংলাদেশে দূরশিক্ষণ নামে অনলাইন শিক্ষা তো নেই-ই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার সাহায্যে সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়মিত ক্লাস না করে পড়াশোনা করা যায়। কী কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনলাইন কোর্স অফার করে না বা করতে পারে না সেটি আমার অজানাই।

করোনার মাঝে বাস করে যারা এখন অনলাইন ক্লাস নিয়ে ভাবছেন তারা একটু লক্ষ করুন যে, আমেরিকানেরা শিক্ষাব্যবস্থার অনলাইন রূপান্তর নিয়ে কত আগে কত কিছু ভেবেছে এবং এমন দশটা করোনাকে মোকাবেলা করার বিষয়টি কত সচেতনভাবে প্রয়োগের চিন্তা করেছে। খুঁজে দেখলাম আমিও '১৫ সালের এক লেখায় এই উদ্ধৃতিটি দিয়েছিলাম। সার্বিকভাবে আমি শুধু অনলাইন ক্লাসগুলো চালু করার বা চালু রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর বড় বিষয় বলে সেটি এখানে আলোচনা করব না।

ক) ইন্টারনেট : রেডিও-টিভির অনলাইনের আওতা থেকে বেরিয়ে আমরা যদি ডিজিটাল সংযুক্তিভিত্তিক অনলাইন ক্লাসের কথা ভাবি তবে প্রথমেই দরকার ইন্টারনেট। দুই উপায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টারনেট পেতে পারে। ১) মোবাইল, ২) স্থির ব্রডব্যান্ড। মোবাইল ইন্টারনেটের সংকটটি হচ্ছে যে এটির ৪জি প্রযুক্তি যা অনলাইন ক্লাস করার জন্য অপরিহার্য তা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়নি। এর বাইরেও রয়েছে এর দাম। আমি নিজে মনে করি শিক্ষার জন্য ইন্টারনেট ফ্রি হওয়া উচিত। সেই লক্ষ্য নিয়েই ১০ সেপ্টেম্বর থেকে রাষ্ট্রীয় কোম্পানি টেলিটক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহায়তায় অনলাইন ক্লাসের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করেছে। বাকি তিনটি অপারেটর এই পথে আসতে পারে। একই সাথে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নেটওয়ার্ক নয় একটি জাতীয় প্ল্যাটফরম চালু করে সেটিকে বিনামূল্যে করে দিতে পারে। অন্যদিকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসারের জন্য সরকার এরই মাঝে যুগান্তকারী কিছু কাজ করেছে। বিটিসিএল ১২১৬টি ইউনিয়নে ফাইবার অপটিকস যোগাযোগ স্থাপন করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ২৬০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিকস কানেকশন গড়ে তুলেছে। একই বিভাগ আরও ৬১৭টি ইউনিয়নে কানেকশন দেয়ার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর বাইরে দুটি সরকারি ও দুটি বেসরকারি এনটিটিএন বেশ কিছু কানেকটিভিটি গড়ে তুলেছে। এটি হয়তো আমাদের জন্য সুখের নয় যে, আমরা পুরো অবকাঠামোটা এই সময়ে ব্যবহার করতে পারিনি।

খ) ডিজিটাল ডিভাইস : অনলাইন ক্লাসের সবচেয়ে বড় সংকটের নাম ডিজিটাল ডিভাইসের অভাব। অতি ক্ষুদ্রসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অনলাইন ক্লাস করার উপযুক্ত ডিজিটাল যন্ত্রের অধিকারী। দেশের সব ছাত্র-ছাত্রী যাতে ডিজিটাল যন্ত্রের অধিকারী হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এটি আমাদের জন্য খুব আনন্দের যে স্মার্টফোন, ট্যাব বা ল্যাপটপ আমরা এখন দেশেই বানাই। সরকার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোগ নিলেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ডিজিটাল ডিভাইস অতি সহজে পৌঁছানো সম্ভব।

৩) ডিজিটাল কনটেন্ট : এখন পর্যন্ত অনলাইন ক্লাস মানে এটিই দেখেছি আমরা যে, সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে স্কুলের ক্লাসরুমে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাস নিতেন সেই চক-ডাস্টার খাতা-কলম দিয়েই ক্লাসটা নেন। মাঝে মাঝে কেউ কেউ ভিডিও বা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ব্যবহার করেন। কিন্তু বিজয়ের ডিজিটাল কনটেন্ট ফ্রি দেয়ার পরও প্রাথমিক স্তরে এর ব্যবহার সীমিত। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা এসব কনটেন্ট ব্যবহার করে, কিন্তু শিক্ষকেরা ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে না। তবুও আমি মনে করি, আমাদেরকে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সব শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর অবশ্যই করতে হবে। এজন্য সবার আগে দরকার ডিজিটাল কনটেন্ট।

৪) সচেতনতা ও দক্ষতা : অনলাইন শিক্ষা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় সংকটটার নাম হচ্ছে সচেতনতার অভাব। অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী বা নীতি-নির্ধারকদের মাঝে অনলাইন ক্লাস, তার প্রকৃতি, রূপরেখা, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় বিষয়ে প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা গেছে।

প্রচণ্ড সংকট অনুভব করা গেছে ইন্টারনেট, ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার ও ক্লাশ পরিচালনার ক্ষেত্রে।

সবশেষে যে কথাটি আমি বলব সেটি হচ্ছে– করোনা থাকুক, যাক বা আবার অন্য কোনো করোনা আসুক কিংবা কোনোটাই না ঘটুক এবার আমরা শিখেছি যে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর ছাড়া আমাদের সামনে কোনো পথই খোলা নেই। আমরা সমন্বয়হীনভাবে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে যেসব বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি সেটি প্রয়োজনের তুলনায় অনুল্লেখ্য এবং সময়ের প্রয়োজন মেটাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদের নাম মানুষ এবং যার ৬৫ ভাগ নতুন প্রজন্ম সেই বাংলাদেশ শিক্ষায় পিছিয়ে থাকতে পারে না। আমাদেরকে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতেই হবে কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com

মাইক্রোসফট এক্সেল পিভট টেবলস

(৫০ পৃষ্ঠার পর)

টেবলের ভেতরে নিয়ে আসুন–

- মান্থ সারিভুক্ত করুন।
- প্রোডাক্ট কলামে অন্তর্ভুক্ত করুন।
- বিডিটি সেল ভ্যালুতে অন্তর্ভুক্ত করুন।
- ফিল্টারে স্ট্যাটাস অন্তর্ভুক্ত করুন।

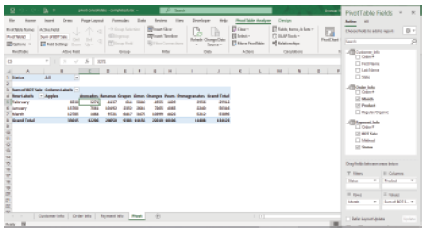

এখন এটিকে অন্য যেকোনো পিভট টেবলের মতোই ব্যবহার এবং পরিমার্জন করতে পারবেন।

উপসংহার

এক্সেল ২০১৩-এর নতুন ডাটা মডেল ফিচার ব্যবহার করে আপনি একটি সমন্বিত পিভট টেবল তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ওয়ার্কশিট থেকে সেরা ফিল্ডগুলো বাছাই করতে পারবেন। মনে রাখবেন, প্রতিটি টেবলের সারিগুলো একটি আরেকটির সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত হতে হবে। টেবলগুলোর সাথে একক মূল্যগুলোর কমন ফিল্ড থাকলেই আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কজ

ফিডব্যাক : anowar@trainingbangla.com